এক জোনাকি-শোভিত রাতের মায়াকান্না

রোজিনা শিল্পী

কী দুষ্ট মেয়ে! নাম তার জোনাকি। তার দেখা মেলা ভার দিনের বেলায়। বড্ড দুষ্ট তো, তাই দিনে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন মা। বিশেষ করে বিকালবেলায়। আজ জোনাকি শোভিত চিরচেনা রাত। চারিদিকে কালো অন্ধকার। ডাহুকেরা ডাকে, মনে অচেনা ভয় জাগে। আমাদের বাড়ির নাম 'কাজী বাড়ি'। বাড়িটি খালপাড় ঘেঁষে উঁচু টিলার উপর বড় বড় গাছ আর ফল, ফুল, বাঁশঝাড়ে ঘেরা। দিনের বেলায় গা ছমছম করে। ভুতের বাড়ি বলা চলে।

সেদিন জোনাকি আর আমি মিলে খাল পার হয়ে মাঠে বসে আছি। দুপাশেই পুকুর আর বিশাল বিশাল নারিকেল গাছ। কানামাছি খেলবে–বায়না ধরেছে ডলি, মনি, নীল আর জোনাকি। সবার বাড়ি কাছাকাছি মাঠের শেষ কোনায়, মোল্লাবাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য জোনাকি ছাড়া বাকি সবাই। জোনাকির বাবা একজন ব্যবসায়ী। বাবাকে কাজের জন্য প্রায়ই ঢাকা শহরে থাকতে হয়। মা আর বোনকে নিয়ে আধাপাকা বাড়িতে থাকে জোনাকির পরিবার। খাল পার হয়ে সরু যে-রাস্তা তার শেষে, বেল-তালগাছের নিচ দিয়ে যেতে হয় জোনাকিদের বাসা। আমাদের কাজীবাড়ির একতলা ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ওদের বাড়ির উঠান। আমার বাবার পেশা শিক্ষকতা। জোনাকি, ডলি, মনি, নীল আর আমি সুবাহ'র বাবার কাছে প্রতিদিন পড়তে যাই।

এখন স্কুল বন্ধ, বাবা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। কী মজা, সাত দিন ছুটি পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি! পাঁচ জনে মিলে কাঠের সাঁকো দিয়ে পার হচ্ছি। আসলে খালটি গিয়ে বংশাই নদীতে মিশে গেছে। আমি আর জোনাকি খেলা শুরু করলাম। আম-জাম-বটপাতা দিয়ে টস করে খেলা শুরু করলাম। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ...। সেদিন সন্ধা নেমে এসেছে। পাখিদের ঝাঁক ঘরে ফিরছে। ডলি, মনি আর নীল বাসায় চলে গেলে রইলাম আমি আর জোনাকি। জোনাকি ভুলেই গেছে যে, রাত হয়ে গেলে বাসায় পৌঁছনো খুবই ভয়ংকর হবে। জোনাকি আজ বাসা থেকে লুকিয়ে খেলতে এসেছে। মা তো জানেই না জোনাকি খেলতে গেছে। মেয়েটা বড়ই দুষ্ট। তাই তার মা ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল, যেন সে বাইরে যেতে না পারে। কিন্তু মা জানেই না যে, মেয়ে জানালা খুলে লুকিয়ে খেলতে চলে গেছে সুবাহর সঙ্গে।

সন্ধা নেমে গেছে, চারিদিকে অন্ধকার, জোনাকিরা মিটিমিটি আলো দিচ্ছে। আর সুবাহকে দেখলাম দূরের একটি তালগাছের নিচে একজন লোকের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে। অন্ধকারে ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। জোনাকি আর আমি কাঠের সাঁকো পার হয়ে, মানে কাজীবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই জোনাকিদের বাড়ি যেতে হয়, আর আজ রাতে হয়ে

গেছে। আমাদের বাড়ির দারোয়ানকে দিয়ে জোনাকিকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। তালগাছতলা পার হয়ে জোনাকি বাড়ি গেল। প্রায় ১৫ মিনিট পর পাহারাদার কাকু ফিরে আসলেন, আর আমিও আমার ঘরে ঢুকলাম।

মা বসে আছে হাতে লাঠি নিয়ে, ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মার রাগ পানি হয়ে গেল। যাই হোক, মায়ের মমতার কথা নাই-বা বললাম। গোসল করার পর মা আমাকে কবুতরের মাংস দিয়ে নিজ হাতে খাওয়াল। একটু অবসর নিয়ে রাতে পড়তে বসাল। কবিতা মুখস্থ করে মার কাছে পড়া দিয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

দূর থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আলো ফুটলে মা জালানা খুলে দিলেন, দক্ষিণের জালানা দিয়ে রোদ আসছে। ইহ! পাখির কিচিরমিচির শব্দে আর ঘুমোতে পারলাম না। মা বাগানে হাঁটতে গেলেন। আমিও নাস্তা সেরে মার পিছু নিলাম। দেখলাম মা আরও কিছু ফুলের গাছ লাগাচ্ছেন। আমাদের পরিবারের সবাই বৃক্ষপ্রেমী। আমরা দু-বোন। আমি আর রেখা আপু। রেখা আপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রী তখন। আমি তখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। ঢাকাতে ছোটো ফুপুর বাসায় আপু থাকেন রেখা আপু। বাবা প্রায় আপুকে দেখতে ঢাকায় যায়।

আমাদের বাড়ি সাভারের বংশাই নদীতে মিশে যাওয়া খালের পাশেই। আমাদের ফুলবাগান থেকে কুড়িয়ে নিলাম কিছু শিউলি আর বেলি। বারান্দায় বসে মালা গাঁথা শুরু করলাম। হাতে জড়িয়ে নিলাম বেলি ফুলের মালা। আর মাকে দিলাম শিউলি ফুলের মালা। কাজীবাড়িকে এককথায় ভূতের বাড়ি বলা যায়। পুরো বাড়িটা জলপাই, আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বেল, তাল, লিচু, জাম, কামরাঙা, পেয়ারাসহ আরও অনেক গাছে ঘেরা। আজ জোনাকিকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। তখন তার কাছে জানতে চাইলাম, কাল তার বাড়িতে সমস্যা হয়েছিল কি না। ও যা বলল, তা শুনে আমি অবাক। ও বলল, রাতে নাকি হোসেন কাকা তালগাছের সঙ্গে বলছিলেন। প্রায় রাতে ওনাকে তালগাছের নিচে পাওয়া যায়। মাও বলল।

হোসেন আর হাসান কাকারা দুই ভাই। পাশাপাশি বাড়ি। দুজনই বেশ ভালো। টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই, জমিজমারও কোনও অভাব নাই। যাক সেসব কথা। বিকাল হয়ে গেছে, আমি জোনাকিকে নিয়ে ছাদে গেলাম। গিয়ে দেখি জালালি কবুতর ছাদের ছোট্ট কোণে বাসা তৈরি করেছে। এরা কিন্তু পোষা নয়। নতুন তিন জোড়া কবুতর কিনে ছাদের এক কোনায় রেখেছি। আব্বু আরও দুটো কবুতর কিনে দিয়ে ঢাকায় ছোটো ফুপুর বাসায় গেলেন। এখন জোনাকি আর আমার প্রিয় পুতুল—নাম তার ডলফিন, ওদের নিয়ে ছাদেই খেলছি। তেঁতুল গাছে অনেক তেঁতুল ধরেছে। ওয়াও!

আমি লাঠির মধ্যে একটা ছোটো কাঠি বাঁধলাম। একে কুটা বলে। দুজন মিলে ধরে গাছের

ডালে আটকালাম কুটাটা। ওমা, একি! কুটাটা ধরে টানার পর আর আসছে না! ঘন পাতার নিচে কে জানি টানছে। হঠাৎ চারপাশে বাতাস বইতে শুরু করল। পিছে তাকালাম, আরও অবাক হলাম–একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। আবার কুটা ধরে টান দিলাম, একই অবস্থা। এবার খুব ভয় পেলাম দুজনই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে প্রায়। শেষবারের মতো আবার দুজন মিলে দিলাম টান। যা ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যেই টান দিয়েছি, লাঠিটা গাছের ভিতরে গেল হাত থেকে ছুটে। আমরা দুজনই চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলাম কবুতরের বাসায় কাছেই।

মা চিৎকার শুনে আমাদেরকে ঘরে নিয়ে গেছে। পরে কি ঘটেছে মা আমাদেও আর জানায় নি। প্রায় এক মাস অসুস্থ ছিলাম। জোনাকিও অসুস্থ ছিল। মা এরপর থেকে আমাদেরকে আর একা ছাদে যেতে দিতেন না।

প্রায় দুমাস পর জোনাকিকে দেখতে যাব ভাবলাম। মাও চলল আমার সঙ্গে। সকাল সকাল রওনা হলাম। পথে হাসেম কাকার কান্নাকাটি শুনে দাঁড়ালাম। যা শুনলাম তা খুবই দুঃখজনক। তালগাছটা হঠাৎ ভেঙে হোসেন কাকার বাড়ি গিয়ে পড়েছে। তালগাছটা মৃত ছিল। হঠাৎ করেই কাল রাতের ছোটো ঝড়ে ভেঙে গেছে। কাকা নাকি সারা জীবনে যা আয় করেছেন সব এই গাছের ভিতরে জমিয়েছেন। খেয়ে না খেয়ে জমিয়েছেন। কৃপণ তো, তাই কাউকে জীবনে কিচ্ছু দেয় নি। তার বুকফাটা কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে গেল।

অদ্ভুত হলেও সত্য এই তালগাছ দশজন লোক দিয়েও এক চুল সরাতে পারল না। যার বাড়িতে তালগাছ ভেঙে পড়ে আছে উনি অনেক দয়ালু, দানশীল মানুষ। দুই ভাইয়ের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় অমিল। একজন খরচ না করে শুধু জমিয়ে গিয়েছে। আর একজন নিজের দরকারে খরচ করেছেন। রশি দিয়ে বেঁধেও নিয়ে যাওয়া হলো না। দয়ালু হোসেন কাকা ও আমি অনেক চেষ্টা করেও সফল হলাম না। পরে হোসেন কাকা টাকাগুলো গাছের ভিতর থেকে বের করে বালতিতে ভরে সেই কৃপণ কাকা হাসেমকে দিলেন। এমন ঘটনা নিজ চোখে দেখব ভাবি নি।

মা আর আমি জোনাকিদের বাসায় আজ থাকলাম। সকাল হলে বাড়ি চলে এলাম। দুদিন পর, বিকেলে শুনলাম কৃপণ হাসেম কাকা মারা গেছেন। বালতিভরা সব টাকাপয়সা ওভাবেই ছিল। তিনি শান্তিতে নিজ টাকা খরচ করেও যেতে পারলেন না। সবার মুখে একই কথা।

অনেক দিন কেটে গেল, জোনাকিরা মিটিমিটি করে জ্বলছে। আজকের প্রকৃতি কেমন যেন নিথর। শীতল দমকা বাতাস শরীরে শিহরণ জাগায়। কীভাবে দিন চলে যাচ্ছে টেরই পাই নি। আমরা অনেকদিন হলো খেলতে যাই না। হঠাৎ বিকালে জোনাকি হাজির। আগের মতোই খেলতে যাই খালপাড়ের মাঠে। মাঠের নাম দিয়েছি স্বপ্নভূমি। আসলে খালপাড়ের নাম হচ্ছে কুদালধুয়া। কথিত আছে এই খাল নাকি কয়েকজন পরী সোনার কোদাল দিয়ে

কেটে তৈরি করেছে। নদীতে একজন লোক রাতে মাছে ধরতে এসে ঘুমিয়ে যায়। ভোরে আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে দেখে একজন পরী কাদামাখা কোদাল রেখে চলে যাচ্ছে। এক রাতেই সেই খাল তৈরি হয়েছিল। এ কারণেই এই জায়গার নাম কুদালধুয়া।

শুনেছি প্রতিবছর এই খালে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। চৈত্র মাসে খালে পানি কম থাকে। এখন শ্রাবণ মাস, খালে অনেক পানি। রেখা আপু থাকলে কচুরিপানা দিয়ে ভেলা তৈরি করে ঘুরতাম। কাঠের সাঁকো প্রায় ডুবে যাবে মনে হচ্ছে। আমরা সেখানে প্রায়ই ওড়না দিয়ে মাছ ধরে টুনাপতি মানে পিকনিক খেলতাম। রান্না করে সবাই যার যার বাসা থেকে নিয়ে আসতাম। পরে খালে বেঁধে রাখা ডিঙিনৌকায় বসে খেতাম। সে কি ভোলা যায়! সকালে প্রায়ই ঘুরতাম। খালের পানিতে গোসলও করতাম। একদিন আমরা খালের পাশে খেলতে যাই। প্রতিদিনের মতোই।

সন্ধ্যা প্রায় হবে, কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলছি। ডলি, মলি, আছে আমাদের সঙ্গেই। গোধুলিবেলায় আমরা লুকোচুরি খেলছি। হঠাৎ পানিতে কী যেন পড়ল মনে হল। ওমা! যা ঘটল তা আমি আজও ভুলতে পারি নি। শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে আষাঢ় চলছে। খালের পানি অদ্ভুদভাবে বেড়েই চলেছে। জোনাকি পানির খুব কাছেই ছিল। সেই শব্দ শুনে ভয়ে যেই না সামনে এগোবে, ঠিক তখনই পা পিছলে পানিতে পড়ে যায়। আমরা সবাই এই দৃশ্য দেখে থমকে যাই। সজল ভাই তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। সে দেখেই পানিতে লাফিয়ে পড়ে; কিন্তু জোনাকিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে সবাই খালপাড়ে এল।

ওর বাবা-মা প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। রাত হয়ে যাচ্ছে এখনও পানি থেকে মেয়েকে উদ্ধার করতে পারল না। চিৎকার আর শোকে আকাশ ভারী হয়ে গেছে। মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। অন্ধকারে চারপাশ ঘেরা। তার মধ্যে জোনাকিরা সামান্য আলো দিচ্ছে। ডুবুরিদের দিয়েও খুঁজে আনতে পারেন নি জোনাকিকে। সেই জোনাকি-শোভিত রাতেও তাকে খুঁজে পাওয়া হলো না। জোনাকি সেই জোনাকিদের মিটিমিটি আলোকে ভালোবাসত। পরদিন কাছের সাঁকোর নিচে ওর পরনের জামাটা যাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতি বছরই বংশাই নদী নাকি একজন মায়ের সন্তানকে টেনে নেয়। সেই ভয়েই তো জোনাকিকে আটকিয়ে রাখা হতো।

বংশাই নদীতে প্রায় শিশু দেখা যায়, মানে ডলফিনের মতো এক প্রাণী ভেসে উঠত, যার চোখে ধরা পড়ে তার পরিবারের দশ বছরের কন্যা নিখোঁজ হয়। যে-ভয় মানুষ বেশি করে, সে-ভয় তাকে গ্রাস করে। চোখের সামনে এসব দেখে আমি কখনও স্বাভাবিক হতে পারি নি। জোনাকি-শোভিত ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাঠের সাঁকোর নিচে কে যেন কাঁদে, শব্দগুলো হাওয়ায় মিশে যেত। খালের মধ্যে এমন ঘটনা আজই প্রথম। অনেকেই বলে, নদী থেকে শিশু এসে নিয়ে যায়। জোনাকিকে হয়তো ওরাই নিয়ে গেছে। আজও মনে পড়ে সেই সময়গুলো। আমার মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। আব্বু আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে

আসে। আজও সেই জোনাকি-শোভিত রাত। মনটা পুড়ে গেল প্রিয় জোনাকিকে ভেবে।